ইউনিট ১: শিক্ষা গবেষণার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

ভূমিকা

প্রতিটি মানুষের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা আছে। কিন্তু কিভাবে বোঝা যাবে যে, কার চিন্তা-ভাবনা সঠিক? যেমন আমরা যদি একটি শ্রেণীর দুইজন শিক্ষার্থীর কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখা যাবে যে, এই একই শ্রেণীর দুইজন শিক্ষার্থীর জন্য প্রেষণা প্রদানের পদ্ধতি একরকম নাও হতে পারে। একজনকে হয়তো বকা দিলে তার ফলাফল ভালো হয় বা ক্লাসে মনোনিবেশ করে, অন্যজনকে হয়তো প্রতিনিয়ত প্রশংসা করে উৎসাহ প্রদান করতে হয় ও সাহস যোগাতে হয়। এই পরিস্থিতিতে কিভাবে বোঝা যাবে কার জন্য কি ধরনের প্রেষণা পদ্ধতি প্রয়োজন? শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা এই ধরনের পরিস্থিতিতে সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম। বর্তমানে প্রতিযোগিতার যুগে যে কোন পেশার পেশাভিত্তিক উন্নয়নের জন্য ক্রমাগতভাবে পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গবেষণার মাধ্যমে যে কোন সমস্যার বৈজ্ঞানিকভাবে সমাধান করা সম্ভব। জ্ঞানের যেকোন শাখায় গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা এবং সকল কর্মকাণ্ডের উন্নতি, অগ্রগতি, সকল-দুর্বল দিক চিহ্নিত করা সম্ভব। শিক্ষকতা একটি অন্যতম প্রাচীন পেশা হলেও এই পেশায়ও বর্তমানে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্বের সকল দেশই কম-বেশি শিক্ষা সংক্রান্ত মৌলিক (Basic) বা প্রয়োগমূলক (Applied) গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। এই ইউনিটে শিক্ষা গবেষণার ধারণা, বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয়তা ও গবেষণা-প্যারাডাইম সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকের উপর সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ হল:

পাঠ- ১.১: শিক্ষা গবেষণার ধারণা ও এর গুরুত্ব

পাঠ- ১.২: শিক্ষা গবেষণার বৈশিষ্ট্য; শিক্ষা-গবেষণার ধাপসমূহ

পাঠ- ১.৩: গবেষণার প্যারাডাইম (Research Paradigm): পজিটিভিজম (positivism), ইন্টারপ্রিটিভিজম (Interpretivism) ও মিশ্র (mixed) গবেষণা প্যারাডাইম

পাঠ ১.১: শিক্ষা গবেষণার ধারণা ও এর গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা গবেষণার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন এবং
- প্রচলিত শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গবেষণার ধারণা

মানব মন কৌতুহলী। প্রতিনিয়ত তার মনে নিত্য নতুন প্রশ্নের সঞ্চার হয়। মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার একটি সুনির্দিষ্ট রূপই হল গবেষণা। মানব মনের অসংখ্য প্রশ্ন বা জানার ইচ্ছে থেকেই গবেষণার উৎপত্তি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যে সুনির্দিষ্ট উপায় বা কৌশল প্রয়োগে মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় তাই হল গবেষণা। সুপরিকল্পিত ও সুসংঘবদ্ধ উপায়ে ধারবাহিক তথ্য সংগ্রহপূর্বক সেই তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে যখন কোন সমস্যার নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় সেই পদ্ধতিকে গবেষণা বলা হয়।

শিক্ষা গবেষক John W. Best এর মতে, "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা বিশেণ্ডষণের আরও আনুষ্ঠানিক, সুসংবদ্ধ ও ব্যাপক প্রক্রিয়াকে গবেষণা হিসেবে অভিহিত করা যায়।" জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের পাশাপাশি নতুন জ্ঞান সৃষ্টির জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি, প্রসার, উন্নতি অথবা পরিবেশের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা, নিজস্ব উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা কিংবা নিজের সংঘাতের সমাধানের পথ খুঁজে বের করার জন্য গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

সময়ের সাথে সাথে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীগণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। এভাবেই সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যেকোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া ও নতুন জ্ঞানের সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা গবেষণা বিশ্বস্তরূপে আবির্ভুত হয়েছে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা করার উদ্দেশ্য হলো শিখন-শেখানো কার্যক্রমের জন্য নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি ও এর মাধ্যমে শিক্ষা অনুশীলনের মানোন্নয়ন করা। শিক্ষা গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

শিক্ষার্থীর শিখন (Learning): কোন পদ্ধতি বা কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয় ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে সে ব্যাপারে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন (Teaching Methods): শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম করার জন্য কোন শিক্ষণ পদ্ধতি সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে তার বিশদ ধারণা লাভ করা যায়।

প্রেষণা(Motivation): কিভাবে শিক্ষার্থীদের নতুন জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করা যায় ও প্রেষণা দেয়া সম্ভব যা শিক্ষার্থীকে একজন পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে।

শিক্ষার্থীর বিকাশ(Development): শিক্ষার্থীর পরিণমন ও তার জ্ঞানগত, সামাজিক ও আবেগিক দক্ষতার বিকাশ কিভাবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের সাথে সম্পর্কিত এবং শিক্ষার্থীর বিকাশে ভূমিকা পালন করে তা জানা যায়।

শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা(Classroom Management): কি কি কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ শ্রেণী ব্যবস্থাপনা সম্ভব সে ব্যাপারে জ্ঞানলাভ করা যায়।

এক কথায় বলা যায়, শিক্ষা গবেষণা হলো শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত সুপরিকল্পিত উপায়ে সংগৃহিত তথ্য ও এর যথাযথ বিশ্লেষণ। শিক্ষা গবেষণায় শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয় (aspect) অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমন: শিক্ষার্থীর শিখন, শিক্ষণ-পদ্ধতি, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন।

এবার আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কিছু কথা বলব। একটি রাষ্ট্র যখন তার জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায়শ বিভিন্ন সমকালীন অসম্পূর্ণতা ও অসামঞ্জস্যতা চিহ্নিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ কর্তৃক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয় তাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে অসম্পূর্ণতা ও অসংগতি ধরা পড়ে। পাইলট টেস্টিং এর জন্য যখন পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ করা হয় তখন শ্রেণিকক্ষে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকগণ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় তারাও মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রের ধারা, মানবন্টন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে শিক্ষা বৎসরসমূহের ক্লাশসমূহের ক্লাশগুলোতে যেন এ সমস্ত অসুবিধা মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হয় তার জন্য শিক্ষককেও শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণ নির্ভর গবেষণা করতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা হলো কার্যকরী শিক্ষণ-শিখনের জন্য নতুন জ্ঞান সৃষ্টির হাতিয়ার। বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণালাভ ও তার সমাধানের উপায়। গবেষণার মাধ্যমে মিথ্যাকে মিথ্যা ও সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। শিক্ষা অনুশীলনের উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। নতুন জ্ঞানের সাথে পুরাতন জ্ঞানের অসামঞ্জস্যতা নির্ণয়, জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধি করার মাধ্যম হলো শিক্ষা গবেষণা।

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে মৌলিক, কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে দাতাসংস্থার অর্থ সাহায্যে যেসব শিক্ষা প্রকল্প চালু করা হয় সে সমস্ত প্রকল্পের নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ নিজেরা কিংবা গবেষক নিয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের মূল্যায়ন কাজের জন্য গবেষণা করেন। আমরা বলতে পারি, শিক্ষা পদ্ধতি ও এর সাথে সম্পর্কিত যে কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, অঙ্গ সংস্থাসমূহ শিক্ষা সম্পর্কিত ঘটনার কার্যকারণ নির্ণয়ের জন্য যে ধরনের গবেষণা কাজ করেন তা সবই শিক্ষা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত

এবং সময় ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এ ধরনের গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে।

শিক্ষাক্রম, শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী প্রণয়ন ও ব্যবহার, পাঠ্যপুস্তক এর বিভিন্ন দিক, শিক্ষার্থীর শিখন, শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি, শিক্ষা মূল্যায়ন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহের অসঙ্গতি, দুর্বলতা ইত্যাদি দিক অবলম্বনে শিক্ষা গবেষণা কাজ পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা আজকের বিশ্বায়নের যুগে দ্রুত উন্নয়নশীল বিশ্বে অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা গবেষণার মাধ্যমে কোনো সমস্যার কি ধরনের সমাধান বের করা হয়?
- ক. অনির্ভরযোগ্য
- খ. সর্বজনীন
- গ. নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য
- ঘ. সহজ সমাধান

২. কোন বিষয়ের উপর শিক্ষা গবেষণা পরিচালনা করা যায়?
- ক. বর্তমান শিক্ষার অসঙ্গতি
- খ. পাঠ্যসূচি নির্বাচন
- গ. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ
- ঘ. উপরের সবগুলো

সঠিক উত্তরঃ ১। গ; ২। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষা গবেষণা বলতে কি বোঝায়?

২. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে শিক্ষা গবেষণার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ ১.২: শিক্ষা গবেষণার বৈশিষ্ট্য: শিক্ষা গবেষণার ধাপসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা গবেষণার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষা গবেষণার ধাপসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।

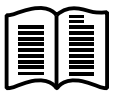

শিক্ষা গবেষণার বৈশিষ্ট্য

শিক্ষা গবেষণা সাধারণত কোনো সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে করা হয়। এক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় বা প্রচলিত তথ্যকে নতুনভাবে যাচাই করা হয়। পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনা বা বাস্তবসম্মত বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হয়। গবেষণা সুসম্পন্ন করার জন্য সঠিক পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা প্রয়োজন। শিক্ষা গবেষণায় সতর্কভাবে বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে গবেষণা পদ্ধতি নির্ণয় ও তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষণার ফলাফল সাধারণীকরণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় যেন পরবর্তীতে তা অনুমান বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিম্নে শিক্ষা গবেষণার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-

- **নতুন জ্ঞনের সন্ধান ও সমস্যা সমাধান:** নতুন জ্ঞানের অন্বেষণ করাই গবেষণার প্রথম কাজ। গবেষকগণ পুরাতন সত্য ও সূত্রের স্থলে নতুন জ্ঞান ও সূত্র সন্ধান করে থাকে। এতে প্রাথমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে জ্ঞান লাভ করা যায়। গবেষক সর্বদা কোন না কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। গবেষণার বিষয়কে সমস্যা আকারে বিবেচনা করা হয়। উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্যই গবেষণা করা হয়।
- **চলকগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়:** গবেষণা দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে কোন সমস্যার সমাধান করে থাকে। এই চলকগুলোর মধ্যে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সম্পর্ক নির্ণয় করাই গবেষণার একটি অন্যতম প্রধান কাজ।
- **যুক্তি প্রয়োগে সমস্যাদির বিশ্লেষণ ও তত্ত্বের প্রসার:** গবেষণায় কঠোর যুক্তি প্রয়োগ করে সমস্যাদির ব্যাখ্যা করা হয়। যুক্তিনির্ভর উপায়েই সমস্যার বিশ্লেষণ করা উচিত। গবেষণা তত্ত্বের প্রসার ঘটায়। গবেষণার ফলাফলের সার্বিকীকরণের মাধ্যমে তত্ত্বকে প্রসারিত করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র গবেষণা থেকে বৃহৎ তত্ত্ব এভাবে বেরিয়ে আসতে পারে।

- **নিরপেক্ষতা, যথার্থতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা:** গবেষককে নিরপেক্ষ ব্যক্তি হতে হবে। কঠোর পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়ে গবেষক গবেষণার তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ফলাফল তৈরি করবেন। এক্ষেত্রে অনুমিত সিদ্ধান্তকে শুধুমাত্র প্রমাণ করার দিকে অবিচল না থেকে যুক্তি, তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। গবেষণা হবে যথার্থ ও নৈব্যক্তিক। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণা করা হয় বলে এতে প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষতা থাকে এবং গবেষণাটি যথার্থ ও নৈর্ব্যক্তিক হয়।
- **সাধারণ সূত্র আবিস্কার ও ভবিষ্যৎবাণী:** গবেষণার মাধ্যমে যুক্তিসম্মত তত্ত্ব বা সাধারণ সূত্র আবিস্কার করা হয়। প্রতিটি গবেষণার প্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহ বা ফলাফল তার সাধারণ সূত্র প্রদান করে থাকে। সঠিক গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যতের ঘটনাপুঞ্জ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করা সম্ভব। ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে বা পরিস্থিতির কিরূপ পরিবর্তন হতে পারে তা বর্তমানে গবেষণা করে অনেকটাই নির্ণয় করা সম্ভব।
- **সুনিপুণ, ধারবাহিক ও সঠিক অনুসন্ধান সংখ্যায় প্রকাশ:** অতি সতর্কতার সাথে গবেষণা পরিকল্পনার পর গবেষণা করা হয়ে থাকে। এতে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করা হয়। ভুলত্রুটি এড়িয়ে সুনিপুণ, ধারবাহিক ও সঠিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি করা হয়। গবেষণার প্রাপ্ত পরিমানগত ও গুণগত তথ্যাদি যতদূর সম্ভব সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। সংখ্যায় প্রকাশিত তথ্যাদি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য, গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও সহজে বোধগম্য হয়।
- **সময়সাপেক্ষ, শ্রমসাপেক্ষ, ব্যয় বহুল ও কষ্টকর কাজ:** গবেষণা অধিক সময় ও পরিশ্রমের কাজ। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সত্যের অনুসন্ধান গবেষণার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গবেষণা করতে অর্থের প্রয়োজন হয়। অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সুদক্ষ গবেষক দ্বারা গবেষণাকর্ম করলে কাংক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায়, কিন্তু এতে ব্যয় হয় প্রচুর।
- **ধৈর্য্যশীল, ধীরস্থির ও সাহসিকতাপূর্ণ কার্যক্রম:** গবেষণার জন্য প্রচুর সময়, শ্রম ও কষ্ট করতে হয়। তাই গবেষককে ধৈর্য্যশীল ও ধীরস্থির থাকতে হবে। গবেষককে হতে হবে খুবই সাহসী। কোন কোন গবেষণা করতে ও ফলাফল প্রকাশ করতে গবেষককে অপ্রিয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সাহসিকতার সাথে এসব মোকাবেলা করে সত্যের অনুসন্ধান ও প্রকাশ করা গবেষকের উচিত।
- **সতর্ক রেকর্ড ও রিপোর্ট প্রকাশ করার কাজ:** গবেষককে একজন জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ হতে হয়। যে বিষয়ে তিনি গবেষণা করতে ইচ্ছুক ঐ বিষয়ে তার প্রচুর জ্ঞান, দক্ষতা থাকা উচিত। গবেষণার তথ্যাদি অতি সতর্কতার সাথে রেকর্ড করতে হয়। এসব তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল রিপোর্ট করার জন্য আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

শিক্ষা গবেষণার ধাপসমূহ

আপনারা পূর্বেই ধারণা পেয়েছেন যে, শিক্ষা গবেষণা সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে, তাই এই গবেষণা ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করার জন্য কিছু ধারাবাহিক ধাপ অনুসরণ করা হয়। শিক্ষা গবেষণার এই ধাপসমূহ একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কিত। যদি কোনো একটি ধাপে পরিবর্তন আনা হয় তাহলে পুরো প্রক্রিয়াটিতে সেটি প্রতিফলিত হবে। অন্যান্য যে কোন প্রকৃতির গবেষণার ন্যায় শিক্ষা গবেষণার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত ধাপগুলো সংযুক্ত থাকে। সাধারণত, ছয়টি ধাপ অনুসরণ করা হয় পুরো গবেষণা প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করার জন্য।

১. গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Identify the Problem)**:** অর্থাৎ কি সমস্যা নিরুপণ বা সমাধানের উদ্দেশ্যে গবেষণা কার্য পরিচালনা করা হবে তার একটি বিস্তৃত ধারণা নেয়া। এর মধ্যে গবেষণার বিষয় বা ইস্যু নির্বাচন করা এবং এই বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটাও প্রমাণ করতে হবে, সেই সাথে কে বা করা এই গবেষণা থেকে উপকৃত হবে সেটিও চিহ্নিত করতে হবে।

২. গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা(Review the Related Literature)**:** সংশ্লিষ্ট সাহিত্য হতে পারে কোনো জার্নাল আর্টিকেল, ম্যাগাজিন, বই, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কিত কোনো তথ্য বা উপাত্ত। সাহিত্য পর্যালোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো এই বিষয়ের বর্তমান অবস্থান ও অন্যান্য গবেষণায় সেটি কোন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে তা তুলে ধরা। চারটি অংশ রয়েছে এই ধাপে:

- গবেষণা সমস্যার মূল শব্দসমূহ (Key Terms) চিহ্নিত করা। সাধারণত ২-৩টি মূল শব্দ থাকে যা ইন্টারনেট থেকে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য খুঁজতে সাহায্য করে।
- একই ধরনের বিষয় সম্পর্কিত গবেষণাসমূহের বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও উপাত্ত একত্রিত করা।
- সতর্কতার সাথে গবেষণার সমস্যার সাথে সম্পর্কিত সাহিত্যসমূহ মূল্যায়ন ও নির্বাচন করা।
- বড় ক্যাটাগরি বা কাঠামোতে এই সাহিত্যসমূহ ভাগ করা।

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার জন্য ধারণা মানচিত্র (Concept Map) তৈরি করলে সহজেই তথ্যসমূহ চিহ্নিত করা সম্ভব।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Specifying a Research purpose)**:** এই ধাপে গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী গবেষণার প্রশ্ন নির্বাচন করা হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গবেষণার প্রশ্ন সবসময় গবেষণার উদ্দেশ্যকে সংকীর্ণ আকারে সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওয়ার জন্য তৈরি করা হয়। গবেষণা পদ্ধতি নির্বাচনের পূর্বেই গবেষণার প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়।গবেষণার আকার অনুযায়ী সাধারণত কয়েকটি গবেষণা প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি নির্বাচন (Designing Research Study)**:** গবেষণা প্রশ্নের (Research Question) উত্তর পাওয়ার জন্য কোন পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি উপযোগী তা ঠিক করা হয়। তিন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি রয়েছে। যেমন: গুণগত (Qualitative) গবেষণা, পরিমাণগত (Quantitative) গবেষণা ও মিশ (Mixed) গবেষণা পদ্ধতি। গবেষণা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পুরো গবেষণা কার্য পরিচালিত হয়। এই ধাপে গবেষণার তথ্যবিশ্ব (Population) নির্বাচন করা হবে এবং নমুনায়ন পদ্ধতি কি হবে তা সমগ্র পপুলেশন এর প্রতিনিধিত্বশীল কিনা সে ব্যাপারে বর্ণনা করা হবে। গবেষণার কাজে কে বা কারা তথ্যদাতা হবে, কি কারণে তাদেরকে তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হলো তার কারণ উল্লেখ করা থাকবে। কি কি উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে সে ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা করা হবে এবং তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার কি হবে তা পাইলট টেস্টিং এর মাধ্যমে যথার্থতা নির্ণয় পূর্বক উল্লেখ করা হবে। গবেষণা কাজে যে প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয় তা সাধারণত নিম্নোক্ত তিনটি অনুমানের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়-

- উত্তরদাতা (Respondent) পড়তে পারেন এবং প্রশ্নের অর্থ অনুধাবনে সক্ষম।
- প্রশ্নের উত্তর প্রদানের মত তথ্য উত্তরদাতার নিকট রয়েছে।
- উত্তরদাতা সম্পূর্ণ সততার সাথে উত্তর প্রদানে সম্মত।

৫. তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা (Analyzing and Interpreting the Data): প্রথমে তথ্যগুলো পরিষ্কারভাবে সাজাতে হবে। সংগৃহীত তথ্য বিন্যাস ও শ্রেণিবদ্ধকরণ করা হবে। এরপর গবেষণা পদ্ধতি অর্থাৎ গুণগত/পরিমাণগত/মিশ্র গবেষণার ধারা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতে হবে। তথ্য বিশ্লেষণ করা শেষ হয়ে গেলে আনুমানিক যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়েছিল সেটির যৌক্তিকতা যাচাই করতে হবে। যাচাই পর্বের পর এর গ্রহণযোগ্যতা দেখা দিলে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হবে। অন্যথায় এটিকে একেবারে বর্জন করতে হবে কিংবা দেখতে হবে সংশোধন করা সম্ভব কিনা। সিদ্ধান্ত সংশোধন করা সম্ভব হলে নতুনভাবে সিদ্ধান্তটি লিখতে হবে এবং তার ভিত্তিতে আবার তথ্য সংগ্রহ পর্যায়ে ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ নতুনভাবে পরীক্ষণটি শুরু করতে হবে।

তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা শেষ হলে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে ফলাফল পাওয়া যাবে তার বর্ণনা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার ফলাফলের সাথে তুলনা করতে হবে। এই গবেষণার কি কি সীমাবদ্ধতা আছে তা উল্লেখ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এই বিষয় নিয়ে কি ধরনের গবেষণা করা সম্ভব তার উল্লেখ থাকবে।

৬. গবেষণার রিপোর্ট তৈরি (Reporting Research): গবেষণার রিপোর্ট তৈরির জন্য প্রথমে একটি সারাংশ লেখা হবে এবং পর্যায়ক্রমে ভূমিকা, সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা, ফলাফল ও সবশেষে উপসংহার এর বিশদ বর্ণনা দিতে হবে। তবে গবেষণার বিশদ রিপোর্ট থেকে যখন কোনো জার্নাল আর্টিকেল প্রকাশ করা হয় তখন

নির্দিষ্ট জার্নাল এর নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়। সাধারণত একেক জার্নাল এর নির্দেশনা একেক রকম হয়ে থাকে, তবে মূল ধাপগুলো একই থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু যদি তুলে ধরতে চাই তাহলে বলব শিক্ষা গবেষণা কাজ পরিচালনা করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নিতে হবে তা হল-

- সমস্যা চিহ্নিত করা।

[উদাহরণ: ২০১৭ সালে নবম-দশম শ্রেণির বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য যে পদার্থ বিজ্ঞান বইটি রচিত হয়েছে তা শ্রেণিকক্ষে পড়াতে গ্রামাঞ্চলের বিজ্ঞান শিক্ষকদের অসুবিধা হচ্ছে।]

- এই সমস্যাটিকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে গবেষককে।

[উদাহরণ: গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষকগণ নবম-দশম শ্রেণির পদার্থ বিজ্ঞান বইটি শ্রেণিকক্ষে পড়াতে অসুবিধাবোধ করছেন।]

গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার ভিত্তিতে গবেষকের এরপরের পদক্ষেপ হল তিনি একটি কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
[উদাহরণ: গ্রামাঞ্চলের বিজ্ঞান শিক্ষকদের পদার্থ বিজ্ঞানের স্নাতক ডিগ্রি না থাকার কারণে তারা বইটি পড়াতে পারছেন না।]

এই সিদ্ধান্তটি গবেষককে উপযুক্ত পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং তাকে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত tools বা হাতিয়ার শনাক্ত করতে হবে।

উপরের সমস্যাটি অনুমিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন স্থির ব্যাখ্যা পেতে হলে গবেষক হিসেবে আমরা সরাসরি সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারি। পরবর্তীতে তথ্যবিশ্ব হতে representative sample বা প্রতিনিধিত্বশীল নমুনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করব। যদি প্রশ্নমালা ব্যবহার করি তবে প্রশ্নমালার মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যাবে সেগুলোকে পূর্ব নির্ধারিত কিছু নিয়ম অনুসারে শ্রেণিবদ্ধকরণ করতে হবে। এরপর তথ্য বিশ্লেষণ করে যে সংক্ষিপ্ত রূপ পওয়া যাবে তার সাহায্যে অনুমিত সিদ্ধান্তটি আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে। উপরোক্ত সমস্যাটির ক্ষেত্রে দেখতে হবে ফলাফল যা পেলাম তা কি সমর্থন করে যে গ্রামীণ বিজ্ঞান শিক্ষকদের পদার্থ বিজ্ঞান বইটি পড়াতে সত্যিকার অর্থে অসুবিধা হচ্ছে? যদি স্বচ্ছভাবে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব না হয় তাহলে আমাদেও অনুমিত সিদ্ধান্ত পরিমার্জন করতে হবে বা পাল্টাতে হবে এবং পরিমার্জিত hypothesis এর আলোকে নতুন করে আবার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

অবশ্য প্রয়োজনবোধে গবেষক কোন পদক্ষেপ দীর্ঘায়িত করতে পারেন বা কোন একটি ধাপকে এড়িয়ে যেতে পারেন। উন্নত বিশ্বে গবেষক কখনো কখনো নিজস্ব গতিতে নিজস্ব পদ্ধতিতেও গবেষণা করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. গবেষণার বিষয়কে কি আকারে উপস্থাপন করা হয়?

ক. সমস্যা
খ. সমাধান
গ. তথ্য
ঘ. চলক

২. গবেষণার প্রথম ধাপ কোনটি?

ক. সাহিত্য পর্যালোচনা
খ. সমস্যা চিহ্নিতকরণ
গ. গবেষণার মূল শব্দ চিহ্নিত করা
ঘ. গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ

সঠিক উত্তরঃ ১। ক; ২। খ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষা গবেষণার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
২. শিক্ষা গবেষণা পরিচালনা করার বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা করুন।
৩. শিক্ষাক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব পেশাভিত্তিক গণ্ডির মধ্য হতে একটি সমস্যা চিহ্নিত করুন।

পাঠ ১.৩: গবেষণার প্যারাডাইম (Research Paradigm): পজিটিভিজম (positivism), ইন্টারপ্রিটিভিজম (Interpretivism) ও মিশ্র (mixed) গবেষণা প্যারাডাইম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- গবেষণার প্যারাডাইম সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- পজিটিভিজম (Positivism) এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ইন্টারপ্রিটিভিজম (Interpretivism) এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- মিশ্র গবেষণা (Mixed Research) প্যারাডাইম-এর ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।

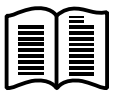

গবেষণার প্যারাডাইম (Research Paradigm)

গবেষণার প্যারাডাইম হলো একটা ধারণাগত কাঠামো(Conceptual Framework) যা গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত মডেল বা নমুনা যা গবেষক কমুনিটির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত এবং অনেক বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রতিটি গবেষণাতেই যেকোনো একটি প্যারাডাইম এর ধারা বা নিয়ম কানুন বা গাইডলাইন ব্যবহার করা হয় গবেষণার পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য।

প্যারাডাইম শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Paradeigma' হতে উদ্ভুত যার অর্থ হলো নকশা বা প্যাটার্ণ (pattern)। এই শব্দটি সর্বপ্রথম ১৯৬২ সালে গবেষক 'Kuhn' ধারণাগত কাঠামো বর্ণনা করতে গিয়ে ব্যবহার করেন। এরপর থেকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন প্যারাডাইম সবচেয়ে ভালো এটা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তারা পরিমাণগত গবেষণাকেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (pure science) ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য সবচেয়ে ভালো বলে বিশ্বাস করতেন।

গবেষণা প্যারাডাইম এর প্রকারভেদ

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার মূলত দুইটি প্রধান গবেষণা প্যারাডাইম হলো পজিটিভিজম ও ইন্টারপ্রিটিভিজম প্যারাডাইম। তবে এই দুই প্যারাডাইম থেকে আরো অনেক প্যারাডাইম সৃষ্টি হয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় প্যারাডাইম হলো মিশ্র-পদ্ধতি প্যারাডাইম (Mixed-Method paradigm)।

পজিটিভিজম প্যারাডাইম (Positivism Paradigm)

গবেষণা প্যারাডাইম এর প্রথম ধারাটি পজিটিভিস্টিক এপ্রোচ (Positivistic Approach) হিসেবে বিবেচিত। এই প্যারাডাইম অনুযায়ী নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য সত্য জ্ঞান সৃষ্টি সম্ভব যা একযোগে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। যখন কোনো গবেষণায় এই ধারা প্রবর্তন করা প্রয়োজন হয় তখন পূর্ব নির্বাচিত কাঠামোর মধ্যে এটি ফেলা যায় যা পূর্ব অনুমানযোগ্য। এই ধারায় গবেষক বা পর্যবেক্ষক অবশ্যই স্বাধীন বা মুক্ত। অর্থাৎ মানব আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা এখানে মুখ্য নয়। হাইপোথিসিস এবং ডিডাকশন এর মাধ্যমে গবেষণা অগ্রসর হতে থাকে। ধারণা বা কনসেপ্ট অবশ্যই কার্যকর (Operationalised) হতে হবে যা পরিমাপযোগ্য। বিশ্লেষণ এর একক সহজ ও সরল ভাবে উপস্থাপিত হবে। পরিসংখ্যানিক সম্ভাব্যতার মাধ্যমে সাধারণীকরণ করা হয়। এর জন্য দৈবচয়নের মাধ্যমে বড় আকারের নমুনা হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

পজিটিভিজম প্যারাডাইম এর বৈশিষ্ট্য

১. বেশিরভাগ বৈজ্ঞানিক (Scientific) ও পরিমাণগত (Quantitative) গবেষণার ধারণার কাঠামো (Conceptual Framework) হিসেবে পজিটিভিজম প্যারাডাইম ব্যবহার করা হয়।

২. পরিমাণগত গবেষণা (Quantitative Research) সবসময় পজিটিভিস্ট এপ্রোচ অনুসরণ করে কারণ তারা হাইপোথিসিস টেস্টিং (Hypothesis Testing) এ বিশ্বাসী।

৩. এই ধরনের গবেষণার ব্যাপ্তি বা পরিসর অনেক বড় হয়।

৪. গবেষকের নিজস্ব মতামত প্রদানের সুযোগ থাকেনা যেহেতু এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

৫. এই গবেষণা পরিমাণগত বা সংখ্যাবাচক তথ্যের (Quantitative Data) উপর নির্ভরশীল।

৬. গবেষণা হাতিয়ার (Research Tools) হিসেবে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র (Structured Questionnaire), কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার (Structured Interview) ও পরীক্ষণ পদ্ধতি (experiment) ব্যবহৃত হয়।

৭. এই গবেষণার ফলাফল নিরপেক্ষ (Objective), নির্ভরযোগ্য (Raliable), যথার্থ (Valid) ও প্রতিনিধিত্বশীল (Generalised) হয়।

ইন্টারপ্রিটিভিজম প্যারাডাইম (Interpretivism Paradigm):

সমাজের প্রতিটি মানুষ আলাদা এবং একেক জনের অভিজ্ঞতা একেক রকম। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কোনো কিছু দেখার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন এবং স্বাতন্ত্র। এজন্য ইন্টারপ্রিটিভিস্ট গবেষকগণ মনে করেন প্রত্যেকের জন্য একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একই রকম ভাবে কাজ করে না। সামাজিক কর্ম তত্ত্ব (Social Action Theory) থেকে এই পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। এই ধারার গবেষকগণ মনে করেন মানুষের কর্ম (Action) বোঝার জন্য তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা প্রয়োজন। একারণেই এই ধারাটি গুণগত তথ্যের

(Qualitative Data) উপর নির্ভরশীল যেখানে উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার বা অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

ইন্টারপ্রিটিভিজম প্যারাডাইম এর বৈশিষ্ট্য

১. বেশিরভাগ সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science) গবেষণার ধারণার কাঠামো হিসেবে ইন্টারপ্রিটিভিজম প্যারাডাইম ব্যবহার করা হয়।

২. গুণগত গবেষণা (Qualitative Research) সবসময় ইন্টারপ্রিটিভিস্টিক এপ্রোচ (Interpretivistic Approach) অনুসরণ করে কারণ তারা মানুষের স্বাতন্ত্র বা ভিন্ন ভিন্ন আচরণে বিশ্বাসী।

৩. এই ধরনের গবেষণার ব্যাপ্তি বা পরিসর সাধারণত ছোট হয়।

৪. তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষণা নমুনার সাথে গবেষকের সম্পর্ক উন্নয়ন ও সহমর্মী হওয়ার ব্যাপার থাকে। গবেষক তথ্য প্রদানকারীর (respondents) প্রতি অনেক বেশি মানবিক আচরণ (Humanistic Approach) প্রদর্শন করেন।

৫. এই গবেষণা গুণগত তথ্যের (Qualitative Data) উপর নির্ভরশীল।

৬. গবেষণা হাতিয়ার হিসেবে কাঠামোহীন/উন্মুক্ত প্রশ্নপত্র (Unstructured Questionnaire), কাঠামোহীন/উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার (Unstructued Interview) ও অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Participant Observation) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

৭. এই গবেষণার ফলাফল ব্যক্তি বিশেষের (Subjective) উপর নির্ভরশীল ও অনেক সময় প্রতিনিধিত্বশীল (Generalised) হয় না।

এককথায় বলা যায়, পজিটিভিজম নিয়ন্ত্রিত হয় নিরপেক্ষতা, পরিমাপযোগ্যতা, পূর্ব-অনুমানযোগ্যতা, সম্ভাব্যতা, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ দ্বারা যা মানুষের আচরণকে পূর্ব-অনুমান করতে পারে। অন্যদিকে, ইন্টারপ্রিটিভিজম নিয়ন্ত্রিত হয় গবেষকের দ্বারা যা একটি বাস্তব পরিবেশে মানব আচরণ পর্যবেক্ষণ করে।

যদিও এই দুটি প্যারাডাইম বিপরীতধর্মী তারপরও বাস্তবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

মিশ্র গবেষণা প্যারাডাইম

পজিটিভিজম ও ইন্টারপ্রিটিভিজম এর গতানুগতিক সীমাবদ্ধতা দূর করতে গবেষকগণ নতুন প্যারাডাইম এর সৃষ্টি করেছে, যা পজিটিভিজম ও ইন্টারপ্রিটিভিজম এর সমন্বয়ে গঠিত। এটি হলো মিশ্র গবেষণা প্যারাডাইম। এই প্যারাডাইম এ গবেষকগণ নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী গুণগত ও পরিমাণগত গবেষণার ধারণা, পদ্ধতি, কৌশল, ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। গবেষক

নিজেই ঠিক করবেন তার গবেষণার প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য গুণগত ও পরিমাণগত গবেষণার কোন সবল দিকটি বেছে নিবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন গবেষক তার গুণগত গবেষণার জন্য হয়তো গবেষণার হাতিয়ার হিসেবে উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার লিটারেচার এর প্রয়োজনে হয়তো কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র দরকার হলো কিছু সংশ্লিষ্ট ফ্যাক্টর যাচাই এর জন্য। সে ক্ষেত্রে গবেষক তার গবেষণার প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য মিশ্র গবেষণা প্যারাডাইম ব্যবহার করতে পারবেন। মিশ্র গবেষণা প্যারাডাইম ব্যবহারের জন্য গবেষকের অবশ্যই পজিটিভিজম ও ইন্টারপ্রিটিভিজম প্যারাডাইম এর সবল ও দুর্বল দিক ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. গবেষণা প্যারাডাইম এর জন্য কোন তথ্যটি সত্য নয়?
- ক. এটি ধারণাগত কাঠামো
- খ. মডেল বা নমুনা
- গ. প্যাটার্ন বা নকশা
- ঘ. শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এর নিয়ম কানুন ব্যবহার করা হয়

২. কোন তত্ত্ব থেকে ইন্টারপ্রিটিভিস্টিক ধারার উদ্ভব?
- ক. মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব
- খ. বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব
- গ. সামাজিক কর্ম তত্ত্ব
- ঘ. দার্শনিক তত্ত্ব

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ৩। গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গবেষণা প্যারাডাইম কি?
২. পজিটিভিজম ও ইন্টারপ্রিটিভিজম প্যারাডাইম দুটির পার্থক্য নিরূপণ করুন।
৩. মিশ্র গবেষণা প্যারাডাইম বলতে কি বোঝেন?